Vol. 58 | No. 3 | 2023

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

শতবর্ষে নজরুলের অগ্নি-বীণা : কবিতায় সাংগীতিকতা

Volume	58
Issue	3
Year	2023
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Sayeem Rana
Published online	June 1, 2023
DOI	10.62328/sp.v58i3.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v58i3.5
Pages	৬৯-৮১
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

শতবর্ষে নজরুলের *অগ্নি-বীণা*: কবিতায় সাংগীতিকতা

Check for updates

সাইম রানা

সাহিত্য পত্রিকা

Shahitto Potrika
eISSN 3006-886X
ISSN 0558-1583
Volume 58
Number 3

সাহিত্য পত্রিকা (২০২৩) ৫৮ (৩): ৬৯-৮১
DOI 10.62328/sp.v58i3.5

সাহিত্য পত্রিকা
বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শতবর্ষে নজরুলের *অগ্নি-বীণা*: কবিতায় সাংগীতিকতা

সাইম রানা*

সারসংক্ষেপ: কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ *অগ্নি-বীণা* (১৯২২) একটি কাব্যগ্রন্থ হলেও এতে সংগীতসহ নানা নিদর্শনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেসূত্রে সাংগীতিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে এই গ্রন্থ সম্পর্কে নতুন কিছু দিক উন্মেচনের চেষ্টা করা হয়েছে। সাংগীতিক পদ্ধতির নমুনায়ন হলো আধুনিক সংগীততত্ত্বের ভাষা ও তার উপাদান এবং তা নিয়ে অন্য শিল্পের সাথে অভিযোজন প্রক্রিয়া। সাহিত্যের অলংকারতত্ত্বের কিছু উপাদানও এই প্রক্রিয়ার সহগামী, যেমন ধ্বন্যাত্মক শব্দ, নাট্য ও সংলাপময়তা, আকর ও উদ্দীপিত সংগীত ও তার বাদ্যানুষঙ্গ, এমনকি মিথ। কবিতার সাথে আবৃত্তি ও সুরের দ্বান্দ্বিক দিক আলোচনা এবং ছন্দ-অলংকারের বিষয়ের নতুন কিছু প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে। *অগ্নি-বীণা* একটি লিখিত শিল্প হলেও আধুনিক পরিবেশনা শিল্পেরও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সেই দিকটির বিশ্লেষণও এই প্রবন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে।

সংগীতের উপাদান ও তার অভিযোজন

আধুনিক সংগীতবিজ্ঞান ছয়টি উপাদানের সার্থক প্রয়োগে যে-কোনো শিল্পের সাংগীতিকতা বিচার করে থাকে। উপাদানসমূহ হলো rhythm (ছন্দ), tune (সুর), texture (বুনন), timbre (শব্দের গুণ বা তীক্ষ্ণতা), dynamics (শব্দের উচ্চতা বা নিচুতা) এবং form (কাঠামো)। আধুনিক শিল্পকলার মূল্যায়নে প্রত্যেক স্বতন্ত্র শিল্প তার নিজস্ব একধরনের ভাষাভঙ্গি তৈরি করেছে, এমনকি ফিল্মের মতো নবীন শতবর্ষী মাধ্যমও। এই বাস্তবতা থেকে প্রত্যেক শিল্প একে অন্যের সাথে সমন্বয়মূলক কাজ করে থাকে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিতা মূলত গায়েন বা পরিবেশনানির্ভর ছিল। বৌদ্ধ স্তোত্র নিদর্শন 'চর্যা' ও 'দোহা', জয়দেবের *গীতগোবিন্দ,* বড় চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন,* এছাড়া বৈষ্ণবপদাবলি, মঙ্গলকাব্য, পালা বা গীতিকা, প্রণয় পাঁচালি প্রভৃতি সাহিত্যনিদর্শন মূলত মৌখিক এবং গীত হতো পালাক্রমে বা প্রহরে প্রহরে। মৌখিক উপস্থাপনা থেকে কবিতায় নানা ধরনের ছন্দ সৃষ্টি হয়েছে। প্রবণতাসমূহে দেখা যায় স্বর প্রক্ষেপণের বৈচিত্র্য অনুসারে সুরের উপযোগী বা তালের সহগামী নানা প্রকারের ছন্দ (প্রজডি অর্থে) তৈরি হয়েছে। ছন্দের ভেতরে মাত্রার ঝোঁক এবং সংগীতের তালের মাত্রার ঝোঁক সমার্থক হলেও কিছু স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। এই স্বাতন্ত্র্যই প্রত্যেক শিল্পমাধ্যমের ভাষা নির্মাণের নিজস্ব যাত্রাপথকে সুপ্রশস্ত করেছে। যেমন মুক্তছন্দ, অমিত্রাক্ষর, অক্ষরবৃত্তের পদে সুরপ্রদান করা অনেকটা দুরুহ বিধায় গীতিকবিগণ পয়ার, স্বরবৃত্ত, ত্রিপদী ইত্যাদি ছন্দে স্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশ করেন। কারণ স্বরবৃত্ত কিংবা পয়ারে টানা টানা, সমপদী বিভাজনেসুযোগ বেশি পাওয়া যায় বলে পদ বা গীতকে সংগীতে রূপান্তর করা সহজ হয়। তবে যেসকল কবিতায় সুর দেয়া কঠিন,

---

* সহযোগী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যেখানে সাংগীতিক উচ্চারণের (আর্টিকুলেশন) নানামাত্রিক ভাবসৌন্দর্য সৃষ্টি করে, তাকে সাংগীতিকতা বলা অবান্তর হবে না।

সংগীত ও সাংগীতিকতা শব্দদুটির সরল পার্থক্য রয়েছে। সংগীত নয় এমন কিছুর ভেতরও সংগীতের ভাষা লুকিয়ে আছে। যে ভাষার লিখিতরূপ রয়েছে, সেই ভাষার সাহিত্য ধীরে ধীরে সংগীত ও অন্যান্য প্রভাব থেকে বেরিয়ে এসে স্বতন্ত্র ও শিল্পিতরূপে প্রকাশিত হতে পেরেছে। একইভাবে যে সংগীতের লিখিতরূপ রয়েছে, তা সাহিত্য থেকে সরে গিয়ে স্বরূপে প্রকাশিত হয়েছে (উদাহরণস্বরূপ: অর্কেস্ট্রা বা সিম্ফনি, যা আমাদের নেই)। একসময় কবিতা ও সংগীত একই শিল্পবস্তু ছিল। কিন্তু কবিতা যখন লিখিত হতে শুরু করল তখন তা সুরনিরপেক্ষ প্রকাশের পথে ধাবিত হলো। যেমন বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখায় যে নৃগোষ্ঠীর ভাষার লিখিতরূপ নেই, তাঁদের কোনো কবিতা বা উপন্যাস নেই, যা আছে তা মূলত পরিবেশনাগত বস্তু। অর্থাৎ লিখিত ভাষাই একপর্যায়ে সুরনিরপেক্ষ হয়ে উঠতে পারে এবং তার নিজ পরিকাঠামোয় সাংগীতিকতা উদযাপনে সক্ষম হয়।

আবৃত্তির উৎস ও কাব্যিকতা কিংবা সুরের স্বাতন্ত্র্য ও সাংগীতিকতা

সাংগীতিক প্রক্রিয়া উপর্যুক্ত উপাদানের সেতুর উপর ভর করে তার ক্রিয়াশীলতা প্রদর্শন করে এবং সমন্বয়সাধন করতে গিয়ে অন্য শিল্পের অনুগামিতা বা অধীনতাও কখনো কখনো জ্ঞাপন করে। এতে উভয়ের ভাষা ও তত্ত্বীয় উন্নতি ঘটে। দুটি শিল্পাঙ্গিকের মিলনধর্মী মনোভাবের কারণে উভয়ের আরো বৃহৎ পরিসরে এমনকি নতুন কোনো শিল্পভাষা খুঁজে পাওয়ার বিশ্লেষণ তৈরি হয়। যেমন ধরা যাক, ষোল শতকের রেনেসাঁ পিরিয়ডের শেষলগ্নে অপেরায় 'আরিয়া' ও 'রেসাইটেটিভ' নামে দুটি কাঠামো তৈরি হয়েছিল। রজার ক্যামেইন আরিয়া সম্পর্কে বলছেন, 'দ্য মেইন অ্যাট্রাকশন ফর মেইনি অপেরা ফ্যান্স ইজ দ্য আরিয়া, এ সং ফর সলো ভয়েস উইদ অর্কেস্ট্রাল অ্যাকোম্প্যানিমেন্ট' (Kamein, 1992: 147), এবং রেসিটেটিভ সম্পর্কে বলছেন, 'অপেরা কম্পোজার্স অফ্‌ন লিড ইনটু অ্যান আরিয়া উইদ ও রেসিটেটিভ, অ্যা ভোকাল লাইন দ্যাট ইমিটেটস্ দ্য রিদমস্ অ্যান্ড পিচ ফ্লাক্‌চুয়েশনস অব স্পিচ।' (Kamein, 1992: 147), সেই রিসাইট (ইটালিয়ান শব্দ) থেকেই তো আধুনিককালের আবৃত্তির ধারণা জন্মেছে; এর ফলে গীত/কাব্য/পদ্য/কবিতা, এমনকি ছড়া, যাই বলি না কেন, তা প্রাকসিদ্ধ সুর থেকে অবমুক্ত হলো। অন্যদিকে কবিতার গভীরে থাকা ভাব, যা ভাষা-শব্দ কিংবা বাক্য দিয়ে ধরা যায় না, যাকে কাব্যিকতা বলছি, তা সুরের বাহনে চড়ে স্বতন্ত্র এক শিল্পভঙ্গিমায় উড়তে শুরু করল। একই অর্থে সংগীতের মধ্যে যে ভাব বা অনুভাব থাকে, তা মেলোডির শেকল অবমুক্ত হয়ে আবৃত্তির কাঠামোয় অভিযোজিত হলো।

কবিতার উদাহরণস্বরূপ জার্মান কবি ফ্রেডরিক ভন শিলার (১৭৫৯-১৮০৫) ১৭৮৫ সালে 'ওড: টু জয়' কবিতা লিখেছিলেন। ১৮২৩ সালে জার্মান মিউজিক কম্পোজার লুডভিগ ভন বিথোভেন (১৭৭০-১৮২৭) তাঁর নবম সিম্ফনির শেষ মুভমেন্টে সেই কবিতার উপর সুর রচনা করেন। সময়ের আবর্তে বিথোভেনের রচনাকর্মটি এতটাই জনপ্রিয় হয়েছে যে শুধু সুরই 'ওড টু জয়' নামে এখন 'ইউরোপিয়ান অ্যান্থেম' (১৯৭২) (Web: EU)

হিসেবে স্বীকৃত। আরেকটি উদাহরণ হলো, *অগ্নি-বীণা* কাব্যের ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতাটি; ১৯২২ সালের এপ্রিলে কাজী নজরুল ইসলাম অসহযোগ আন্দোলনের ভিত্তিতে রচনা করেন। পরবর্তীকালে নিতাই ঘটক কবিতাটির অংশবিশেষ ‘দ্রুত দাদরা’ তালে সুর করেন এবং এটি স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ‘জাতীয় সংগীত’ হিসেবে স্বরলিপিতে [রেকর্ড: Colombia GE. 7458] উল্লেখ রয়েছে। সুরকাঠামো যে কবিতার রচনালগ্ন থেকেই সৃষ্ট, তার প্রমাণ মিলছে অনলাইন নজরুলকোষ-এর তথ্যমতে, “১৯১০-১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের ভিতর নজরুল ইসলামের লেটো পালা ‘মেঘনাদ বধ’-এ (পালা) গানটিতে ‘তোরা সব জয়ধ্বনি কর’ অংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া এর অঙ্গবিন্যাসও ছিল বর্তমানে প্রচলিত ‘তোরা সব জয়ধ্বনি কর’-এর অনুরূপ।” (*নজরুলকোষ*, অনলাইন) সংগীতের ক্ষেত্রে যেমন র‍্যাপ, হিপ হপে একটি ছন্দকে অবলম্বন করে শব্দ বা আবৃত্তি করে থাকে, যা ১৯৭০এর দিকে আফ্রিকা থেকে উদ্ভূত এবং বর্তমানবিশ্বে খুবই জনপ্রিয়। অর্থাৎ কবিতা যা একটি তাল বা ছন্দকে অবলম্বন করে গাওয়া হয়। র‍্যাপ কবিতার মধ্যে এক ধরনের ছন্দের ঝোঁক থাকে, সেই ঝোঁকই তালে তালে চালিত করে। *অগ্নি-বীণা* কাব্যের প্রায় সব কবিতায় এই ধরনের ঝোঁক দৃশ্যমান।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ, সাংগীতিক আধুনিকতা, অ্যাটোনালিটি ও ‘বিদ্রোহী’ কবিতা

‘বিদ্রোহী’ কবিতায় অবিরল মাত্রাবৃত্তে চলা, ছয় মাত্রার ছকে দাদরা তালের ঝোঁক নির্দেশ করে। খুব একটা গতি নেই, কিছু মুহুর্মুহু উত্থান ও পতনের চিত্রায়ণ – যেন সম্মুখ সমরে কোনও বীরের ধাবমানতায় কোথাও কোথাও বিস্মৃতি, কোথাও বিস্মরণ বা প্রেম কিংবা শ্রান্তি থাকলেও বিশ্রামের সুযোগ থাকে না। বীরের উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে উত্তেজনারহিত বা শান্ত মনোভাব, কিন্তু তার ব্যক্তিত্বে প্রবল তীক্ষ্ণ-ক্ষিপ্রতার আভাস থাকবে, কখনও তা মসৃণ আবার কখনও কঠিন-কঠোর – এরকম বিপরীতার্থক চরিত্র প্রকাশ করে। ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় লয় শীতল (মধ্যলয় অর্থে) হলেও বিষয় ও প্রসঙ্গের নাটকীয় পরিবর্তনের কারণে সেই লয় আকস্মিকভাবে বেড়ে যায়। সেখানে ডাইনামিক ও টিম্বারের উল্লম্বতায় উত্থান ও পতন প্রতিনিয়ত নতুন নতুন উদ্বেগ তৈরি করে। একটি প্রচলিত গানের ধরন বা কাঠামোতে এ ধরনের বিশালত্বকে ধারণ করা সম্ভব হয় না। ফলে তা সিম্ফনির সাথে তুলনীয়, যেখানে মধ্যলয়-ধীরলয়-দ্রুতলয়ের প্রয়োজনমাফিক আন্দোলন থাকে। যেমনটা বিশশতকের মহান সংগীতকার আর্নল্ড শোয়েনবার্গের (১৮৭৪-১৯৫১) কম্পোজিশনে লক্ষণীয়। যাকে বিচক্ষণ-বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে প্রতিবাদ করা বোঝায়। এটাই বিশ শতকের মডার্নিজম-এর প্রধান প্রবণতা। নজরুল সেই দর্শনের বাঙালি প্রচারক, তবে বাঙালির মধ্যে নিশ্চয়ই পুরোধা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিশ্ববাসীকে এই ধরনেরই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল। ‘বিদ্রোহী’ কবিতার অংশ:

> আমি সন্ন্যাসী, সুর-সৈনিক
> আমি যুবরাজ, মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক!
> ... ...
> আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস,

আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ!
আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইসরাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার।

কাব্যাংশের প্রতিটি পদে নতুন নতুন চরিত্র লক্ষণীয়। সেক্ষেত্রে এই কবিতার আবৃত্তির সাথে আবহ অর্কেস্ট্রা যতটা সার্থকভাবে ফুটে উঠবে, সরাসরি গানে অর্থময়তা দান করা ততটাই কঠিন। এই যে একটি শিল্পের সাথে আরেক শিল্পের অভিযোজন প্রক্রিয়া, তা উপর্যুক্ত উপাদানের পরিশীলিত ব্যবহারের ভিত্তিতে নির্মিত হয়। যেমন ফর্ম বা কাঠামোর কথা ধরুন, 'বিদ্রোহী' কবিতায় অবিরল ধাবমানতার দৃশ্য প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে। যাকে মিউজিক্যাল অর্কেস্ট্রায় 'কন্ট্রাস্ট অব মোড' বা 'কাউন্টার হারমনি' দিয়ে পরিচালনা করা হয়। বিশ শতকের সংগীতের ন্যায় কবিতাও বিচক্ষণতার শিল্প হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে লিখিত বা মুদ্রিত গ্রন্থ হলো যেন একটি সিম্ফনি বা শুধুমাত্র একটি বেহালায় বাজানো স্টাফ সিট, অন্য দিকে সেই সিম্ফনি যখন পারফর্ম করা হয় তখন তা পূর্ণ অর্কেস্ট্রার সমান। মুদ্রিত রচনা নিছক পাঠযোগ্য। তাঁর অন্য কোনও আবেদন নেই। (প্রদীপ, ২০১৪: ১৭১)

অগ্নি-বীণা কাব্যগ্রন্থটি তার নামকরণের মধ্যেই ভারতীয় প্রাচীন বাদ্য 'বীণা'র নাম যুক্ত করে সাংগীতিকতা প্রদর্শন করেছে। একই সাথে প্রতিটি কবিতা থিমেটিক হয়েও কাহিনি বা গল্প-নির্ভর থাকেনি। পক্ষান্তরে ধ্বনিময়তাই এই কবিতাসমূহের প্রাণ। অপূর্ব সব ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ সহসা অভিধানে মেলে না, কিন্তু এই ধ্বনিগুলোই আদিমকাল থেকে জীবসত্তা, জড়বস্তু ও প্রকৃতির ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই ধরনের ধ্বন্যাত্মক শব্দ বাংলা ভাষায় বিপুল। বাংলার মধ্যযুগের কবিগণ বিশেষকরে ভারতচন্দ্র রায় (১৭১২-১৭৬০), ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৬৯), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) এ জাতীয় শব্দের সার্থক ব্যবহার করেছেন। ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে 'প্রবাসী' পত্রিকায় বলা হয়েছে:

> শত কথায় যে কাহিনী ভালরূপে বর্ণনা করা যায় না, ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি অতি সংক্ষেপে অথচ অতি স্পষ্টরূপে বিশেষ্যের সেই গুণগুলিকে বুঝাইয়া দেয়। কবিতায় এই সংক্ষিপ্ত অথচ মর্ম্মজ্ঞাপক ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির অভিঘাতে অতি অল্প পরিসরের মধ্যে কোন অপূর্ব্ব ছবির অবতারণা করা যায়। কাব্য-সাহিত্যে উহারা মনের নহবৎ বাদ্য; কি বলিয়া যায়, তাহা যেন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারা যায় না, অথচ মন মোহিত করিয়া ফেলে। ইংরেজি সাহিত্যে ধ্বন্যাত্মক কবিতার সংখ্যা বেশী নহে। আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ কবি এডগার এলেন পো ধ্বন্যাত্মক কবিতা রচনার বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছেন, এবং তাঁহার "দাঁড়কাক" (The Raven) শীর্ষক কবিতাটি এই শ্রেণীর কবিতার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ('প্রবাসী', উইকি: ২৩২)

এই শব্দগুলোই মূলত সাংগীতিক, যা ভাষার সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে অন্য যে কোনো ভাষার সাথে অর্থের যোগাযোগ তৈরি করে। অর্থ না বুঝেও অর্থের খুব কাছাকাছি বোধগম্যতা তৈরি করে। কাজী নজরুল ইসলাম লেটো গানের দলে থেকে এই ধরনের ভাষাসৌন্দর্য আয়ত্ত করেছিলেন। ধ্বন্যাত্মক শব্দের ঝোঁক, দ্বিরুক্তি, যমক, অনুপ্রাস, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি

অলংকার দিয়ে এমন এক ছন্দশৃঙ্খলা তৈরি করে যে তা পরিকল্পিত মেলোডিতে বসিয়ে আলাদা পরিবেশনার প্রস্তুতির দরকার হয় না। কাজী অনিরুদ্ধের আবৃত্তিতে সে ঝোঁক যেন সংগীতেরই পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

তারপরও অনেকেই গান করেছেন, (গিরীন চক্রবর্তীর সুর ও গায়কী, নাসিরউদ্দিন বাচ্চু নির্দেশিত *গেরিলা* ছবিতে কিংবা গণশিল্পী কফিল আহমেদের কণ্ঠে 'বিদ্রোহী' গান হিসেবে গাইতে দেখা গেছে) কিন্তু তা বীর রসাত্মক হয়ে উঠলেও তাতে রোমান্টিক সংগীত প্রবাহেরই স্রোতধারা লক্ষ করা যায়। আদতে নজরুলের কবিতায় যে মুহুর্মুহু আকস্মিকতা এর পেছনে ঐতিহাসিক যোগসূত্র নেই, একথা বলা যাবে না। নজরুল যখন *অগ্নি-বীণা* লিখছেন তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও বলশেভিক বিপ্লবের রেশ এবং কামাল পাশার উত্থান, ব্রিটিশবিরোধী অসহযোগ আন্দোলন চলছে। (দেব্রত, ২০২২: ২৩) এরকম মুহূর্তে আমরা বিশ্বসংগীতের দিকে তাকালে দেখতে পাই, চলচ্চিত্র শিল্পের শব্দ সংযোজনের কালে জ্যাজ ও ব্লুইজের বিস্তার ঘটছে। অন্যদিকে অ্যাটোনাল হারমনির বিকাশে রোমান্টিক যুগের কাঠামোনির্ভর অর্কেস্ট্রা পালটে গেছে। আর্নল্ড শোয়েনবার্গ (১৮৭৪-১৯৫১), অ্যান্টন ওয়েবার্ন (১৮৮৩-১৯৪৫), ইগর স্ট্রাভিনসকি (১৮৮২-১৯৭১) নিউ-রোমান্টিসিজম কিংবা পোস্ট-টোনাল মিউজিকের ভাবনাকে সামনে এনেছিলেন, যা হাজার বছরের বিবর্তনে গড়ে ওঠা সংগীত কাঠামোর মহাপ্রাচীর উপড়ে ফেলেছে। অগ্নি-বীণার 'বিদ্রোহী' সেই প্রলয় এবং সৃষ্টিরই কাব্যিক রূপশৈলী, সেখানে প্রচল ছন্দ ও ধ্বনিভঙ্গি অস্বীকার করে পদবিন্যাসের প্রতি ঝোঁকে। ক্লাসিসিজমের আভিজাত্যও লুটিয়ে পড়েছে বিপন্ন পৃথিবীর ক্ষুধার্ত আহত নিঃস্ব মানুষের শুধু বেঁচে থাকার আর্তনাদের মুখোমুখি। শিল্পের সুরেলা মসৃণ মিহি বুননের কারুকাজ ধসে পড়েছে ফ্যাকাশে বিধ্বস্ততার মুখে। ফলে নজরুলের 'বিদ্রোহী', 'আগমনী', 'ধূমকেতু' কবিতাগুলো কাব্যিক অর্কেস্ট্রা, যা সে কাঠামোবদ্ধ সুবিধাবাদী চক্রের বানানো আইনকে উপহাসে আঘাতে জর্জরিত করতে চেয়েছে। এটিই বিংশ শতাব্দীর শিল্পপ্রবণতা। রুক্ষ-বিধ্বংসী রূপে অনিষ্টকে বিচূর্ণ করে পুনরায় নবসৃষ্টির প্রেরণায় উচ্ছলিত হয়ে ওঠে। 'আগমনী' কবিতা তো সেই ভাষ্যই প্রদান করে।

গীতিনাট্য-ব্যালাড বনাম 'কামাল পাশা' ও 'আনোয়ার'

আবার 'কামাল পাশা' ও 'আনোয়ার' কবিতা গীতিনাট্যের আদলে লেখা। উভয় কবিতাই মঞ্চস্থ করা যায়, তৎকালীন ওপনিবেশিক জীর্ণতার বিপক্ষে তুরস্কের রাজনীতিতে কামাল পাশার উত্থান বিশ্বরাজনীতিকে বদলে দেবার বার্তা নিয়ে এসেছিল। একে 'মিউজিক্যাল থিয়েটারে'র মাধ্যমে উপস্থাপন করাটাই যথার্থ বিবেচনা করেছেন নজরুল। অর্থাৎ সাংগীতিকতার স্পর্শ প্রতিটি পরতে পরতে, তবে তাতে সুর রচয়িতার স্বাধীনতাও রয়েছে, সেক্ষেত্রে কবিতার ছন্দ কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবার সুযোগ নেই। উনিশ শতকের লিটারারি ব্যালাডের যে চর্চা হয়েছে বিশ্বব্যাপী, তাঁর প্রতিশ্রুত পথ বাংলায়ও এসে মিলেছে নজরুলের মাধ্যমে। শিল্প সমালোচকগণের মধ্যে বিতর্ক থাকলেও সংগীত ও সাহিত্যের সম্পর্ক আরো নিবিড় হয়ে উঠতে চেয়েছে; নজরুল তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থে সেই ইশারা দিয়েছেন। বিশেষ করে 'রণ-ভেরী', 'খেয়া-পারের তরণী', 'কোরবানী' এবং 'মোহর্‌রমে' সেই ধরনের

ছান্দসিকতা বিরাজিত।

তবে সাহিত্যে সাংগীতিকতা খুঁজতে যাওয়ার আগে উভয়ের পরিসীমা নির্ধারণ করা যুক্তিপূর্ণ হবে। উভয় শিল্পের অভিযোজন করতে গিয়ে Stiven Paul Scher তাঁর *Essays on Literature and Music (1967-2004)* গ্রন্থে সংগীত ও সাহিত্যের সম্পর্ককে evocation of music বলেছেন (Bernhart 2004, 28)। নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ কবিতা ঠিক সেরূপ সাংগীতিকতায় উদ্দীপিত করে। এমনকি অন্যান্য কবিতার মধ্যে ‘প্রলয়োল্লাস’ সরাসরি গান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত; এছাড়া ‘রক্তাম্বরধারিণী মা’, ‘আগমনী’, ‘ধূমকেতু’, ‘আনোয়ার’, রণ-ভেরী’, ‘শাত্-ইল্-আরব’, ‘খেয়া-পারের তরণী’, ‘কোরবানী’, ‘মোহর্‌রম’। তবে ‘কামাল পাশা’ ও ‘আনোয়ার’ কবিতাদ্বয় গীতিনাট্যের আদলে রচিত, ফলে পরিবেশনার শর্তে এই কবিতাযুগলে সংগীত ব্যবহার করা অনেকটা আবশ্যিক।

স্টিভেন পল-এর সংগীত ও সাহিত্যের সম্পর্ক নির্ণায়ক নকশা:

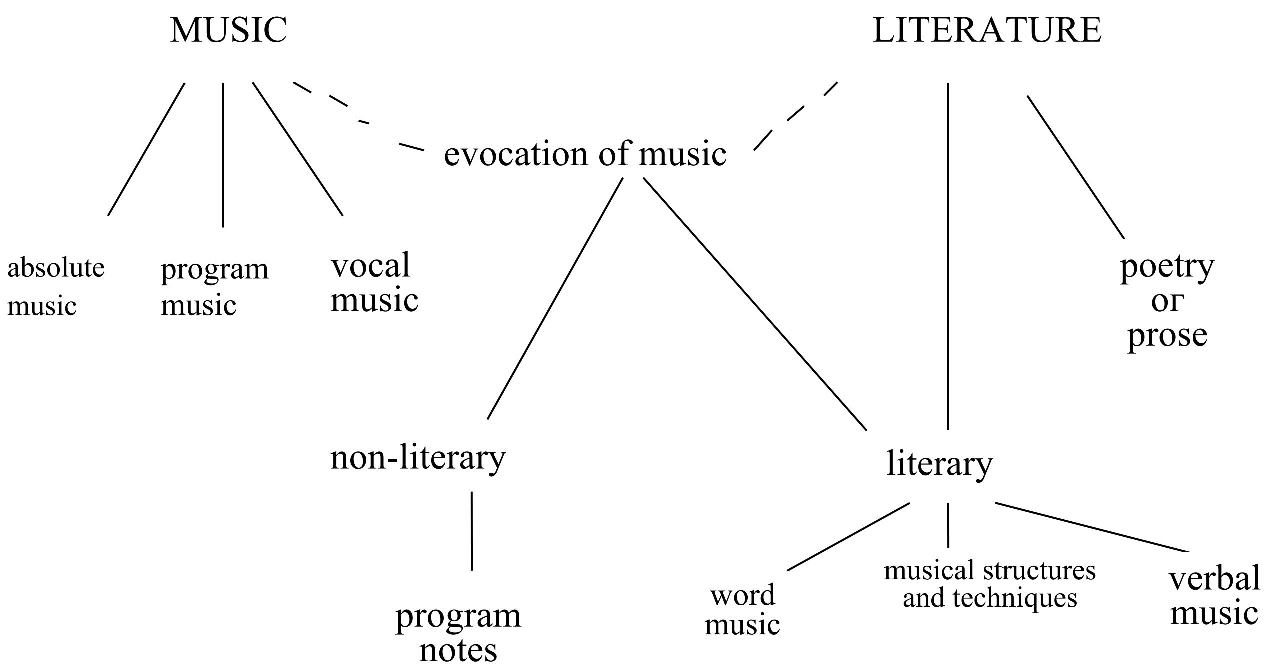

আকর সংগীত ও উদ্দীপিত সংগীত

স্টিভেন পল মূলধারার সংগীতকে তিনটি ভাগে ভাগ করেন; প্রথমত (absolute) পরম বা আকর সংগীত, দ্বিতীয়ত program বা আনুষ্ঠানিক সংগীত এবং তৃতীয়ত vocal music বা কণ্ঠ সংগীত। সাহিত্যে সংগীতের যে দিকগুলো পাওয়া যায় তা হলো শাব্দিক সংগীত (word music), সাংগীতিক কাঠামো বা কৌশল (musical stractures and techniques), এবং বাচনিক সংগীত (verbal music) এবং আরেকটি হলো কবিতা। শিল্পকলার মধ্যে প্রধান একটি শাখা সাহিত্য নির্মাণের জন্য কবি প্রচলিত বা উদ্ভাবনী সাহিত্যকাঠামো এবং কৌশল অবলম্বন করেন, তা পাঠকদের কল্পনাচিত্তকে উদ্দীপিত করে। সংগীতের উদ্দীপনা সৃষ্টিতে কবি সরাসরি সাংগীতিক অভিজ্ঞতা অথবা কোনো স্বরলিপির সাথে সম্পূরক করেন, অথবা তার কল্পনাকে সংগীত দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে দেন। কবিতায় সাংগীতিকতা সম্পর্কে

স্টিভেন বলেন:

> To create literary works of art, the poet projects his imagination to his readers by means of conventional or innovative literary structures and techniques. In all literary evocations of music the poet supplement his ordinary source (i.e., poetic imagination) with direct musical experience and/or a score, or allows his imagination to be inspired by music, he thus assumes the role of transmitter, rendering (suggesting, describing, or creating) music in words. (Bernhart 2004, 29-30)

স্টিভেনের বক্তব্যের সাথে নজরুলের *অগ্নি-বীণার* সাহিত্য নিদর্শনে বেশকিছু সঙ্গতিপূর্ণ দিক রয়েছে। প্রথমত, নজরুল প্রথাসিদ্ধ কিছু রীতি ব্যবহার করেছেন, যেমন মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ব্যবহারে পূর্বজ ছান্দসিক কবিদের ন্যায় ব্যাঞ্জনাময় শব্দের বিপুল ব্যবহার করে পরিবেশনাযোগ্য করে তুলেছেন, সেখানে নিসর্গের ধ্বনি (যেমন: জল ছল্-ছল্, ঝঞ্ঝা হু-হু শন্-শন্), বাদ্যের ধ্বনি (যেমন: দামা দ্রিমি দ্রিমি, ডম্বরু-ঢোলে ডিমিডিমি, মহাশঙ্খ ওম্ ওম্), অস্ত্র আসবাবপত্রের ধ্বনি (যেমন: রথ-ঘর্ঘর, কাঁকন-চুড়ির কন্-কন্, তরবারি ঝনন্-ঝন্, ঢাল-তলোয়ারে খন্-খন্, ভেরী-তূরী গরগর, ঝাঝর ঝম্ ঝম্, তোপ দ্রুম দ্রুম ইত্যাদি), অভিযাত্রার ধ্বনি (যেমন: নৃত্য তাতা থৈ থৈ, শিরদাঁড়া চন্-চন্), ভাব ও রসের ধ্বনি (যেমন: হুরো হো, হাঃ হাঃ হাঃ, দ্রাম দ্রাম দ্রাম) ইত্যাদি ব্যবহার নজরুলের শিল্পবোধে প্রথাসিদ্ধ বিষয়ের সাথে সাথে অভিনবত্বের দিকও উঠে আসে। এই ধ্বনিসঙ্গতি মূলত শব্দময়তার অনুরণনে মন আচ্ছন্ন করে, যাকে উদ্দীপিত সংগীত বলা হচ্ছে মিউজিকোলজিস্টদের ভাষায়।

সংগীত ও বাদ্যানুষঙ্গ

সরাসরি সাংগীতিক উপাদান হিসেবে *অগ্নি-বীণার* ১২টি কবিতা ও একটি উৎসর্গ কাব্যে প্রায় ২৫টি বাদ্যের নাম উল্লেখ আছে। সেখানে যুদ্ধবাদ্যের পাশাপাশি আনুষ্ঠানিক বাদ্যেরও উল্লেখ রয়েছে। যেমন বীণা, বাঁশি বা বাঁশরি, বেণু, তূর্য, বিষাণ, শিঙা, পিনাক, ডমরু, মহাশঙ্খ, করতাল, রণ-বাজা, দামা, রণ-কাড়া, খাঁড়া, ভেরী, তূরী, ঢোল, ঝাঁঝর, রণ-ডংকা, গাজন, দুন্দুভি, নাকাড়া, দামামা, খঞ্জর ইত্যাদি। তবে এর অধিকাংশই আনদ্ধ-অবনদ্ধ (membranophone) বাদ্য। এই বাদ্যের বিশেষত্ব হলো, বীরদের উদ্দীপনা জোগাতে এগুলো যুদ্ধে ব্যবহৃত হতো। বাদ্যসমূহের সাথে প্রথমত নজরুলের পরিচয় ঘটে সামরিক বাহিনীতে যোগদানের পর থেকে। ১৯১৭ সালে তিনি ব্রিটিশ সৈনিক হিসেবে কিছুদিন চাকরি করেছিলেন, ফলে সামরিক ক্যাভালরি বা অক্ষৌহিণীর ধারণা ছিল সুস্পষ্ট। দ্বিতীয়ত, ‘বিদ্রোহী’, ‘রণ-ভেরী’ ইত্যাদি কবিতা মূলত যুদ্ধ-সংক্রান্ত এবং বীরত্বের স্মারকগাথা, তৃতীয়ত তিনি লেটো দলে গান লেখার কাজ করতে গিয়ে *মহাভারত, রামায়ণ* প্রভৃতি মহাকাব্যে যুদ্ধে রণপ্রস্তুতির কলাকৌশল সম্পর্কে জেনেছিলেন। এর সাথে প্রতিটি বাদ্যের ধ্বনি বা বোলের প্রতীকী ভাষাও সার্থকভাবে তুলে ধরার কারণে কবিতা যেন বিপুল ধ্বন্যাত্মক শব্দরাশির ঐকতান সৃষ্টি করেছে। সামরিক অর্কেস্ট্রার বাদ্যের পাশাপাশি *রামায়ণ মহাভারত* পুরাণে উল্লিখিত বীরদের স্বভঙ্গিতে চিত্রিত করতে সংশ্লিষ্ট বাদ্য,

সাথে সেই বাদ্যের অনুরণিত ধ্বনির উত্তুঙ্গ ব্যবহার এই কাব্যগ্রন্থে দৃশ্যমান, এই প্রসঙ্গটি নজরুলের উদ্ভাবনীমূলক দিক নিঃসন্দেহে। বিশেষ করে 'বিদ্রোহী', 'আগমনী', 'ধূমকেতু' ও 'রণ-ভেরী' কবিতায় যেন এক মহা-অর্কেস্ট্রা বেজে চলেছে তুরীয় নিনাদে।

'বিদ্রোহী' কবিতায়:

আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার,
আমি পিনাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দণ্ড
আমি চক্র ও মহাশঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ প্রচণ্ড।

'আগমনী' কবিতায়:

রণে কড়কড় কাড়া-খাড়া-ঘাত,
শির পিষে হাঁকে রথ-ঘর্ঘর-ধ্বনি ঘরঘর।
"গুরু গরগর' বোলে ভেরী তূরী

অথবা

ওঠে ওঙ্কার, রণ-ডঙ্কার,
নাদে ওম ওম মহাশঙ্খ-বিষাণ রুদ্রের।

এই গ্রন্থে পাঁচটি রাগ ও দুটি তালের নামও পাওয়া গিয়েছে। এগুলোকে কোথাও কোথাও পৌরাণিক চরিত্র হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন নজরুল ইসলাম। রাগসমূহ হলো 'বহ্নি-রাগ', 'হাম্বীর', 'ছায়ানট', 'হিন্দোল', 'ভৈরব' এবং দুটি তালের নাম 'কাহারবা' ও 'দাদ্‌রা'। এর বাইরেও তিনি বিভিন্ন সাংগীতিক অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন যেমন, সুরের ব্যথা, অগ্নি-সুর, নৃত্য, বজ্র-গান, ছন্দ, তাল, রাগিণী, বেণু-বীনে গান গাওয়া, গমকি, সুরাসুর, নাদ, আবাহন-গীত, মাতরম, বাজে, প্রলয়-শিষ, সারি-গান, ধ্বনিবে, প্রণবনাদ, তাতা থৈথৈ, তাধিন্-তাধিন্, তাতা-উর্-তাক্ ইত্যাদি।

সাংগীতিক শব্দ, ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনির মধ্যে দেখা যায় বজ্র, জয়ধ্বনি, অট্টরোল, হট্টগোল, ঘর্ঘর, চুরমার, ঠমকি, ওঙ্কার, হুংকার, উল্লাস, ছলছল, ক্রন্দন, হা-হুতাশ, কনকন, ঝরঝর, করতালি, হ্রেষা, কলরোল-কল-কোলাহল, তুড়ি, রোল, (ঝনন্-ঝন্, ঝন্ রণরণ রণ ঝনঝন, দ্রিমি দ্রিমি, তালে-তালে, ঘর্ঘর্, চিৎকার, হন্-হ, শন্-শন্, ডিমিডিমি, কল-কল্লোল, তাথিয়া তাথিয়া, ঝম ঝম, ববম বম বম, ওঙ্কার, ওম-ওম, চন-চন, হৈ রৈ, শন-নন-নন, রিরিরিরি, দ্বিরেফ-গুঞ্জন, প্রণব-নিনাদ, শি-শি-শি, সাঁই-সাঁই, দ্রাম-ট্রাম-দ্রাম, রোনা-রিণ, ঝন-নন-নন, রন-ঝন-ঝন, শেল-গর্জন, কড়-কড়, তোপ দ্রুম-দ্রুম প্রভৃতির ব্যবহার এই গ্রন্থকে মহাবিশ্বের অজস্র ধ্বনিতে কোলাহলময় করে রেখেছে। যেমন 'রণ-ভেরী' কবিতায়:

ঐ ঝন-নন-নন রন-ঝন ঝন ঝঞ্ঝনা শোনা যায়

ওরে আয়

বোলে দ্রিম দ্রিম তানা দ্রিম দ্রিম ঘন রন-কাড়া নাকাড়ায় ।

এরকম ধ্বনিব্যঞ্জনাময় কবিতা বাংলা সাহিত্যে অন্তত বিরল। এখানে মাত্রাবৃত্তের ঝোঁক মূলত সুরের অকৃত্রিম ধারণা তৈরি করে। ফলে আবৃত্তির সময় বাদ্যের স্বর বা ঢঙ চিত্রিত হয় নিজ স্বভাবে।

প্রজেডি ও রিদম: ঝোঁক ও মাত্রা রূপান্তর

সংগীতের উপাদান হিসেবে রিদম বা ছন্দের স্ফূর্তিই মূলত সাংগীতিক অনুরণন তৈরি করে। দেখা যায় ‘খেয়া-পারের তরণী’ কবিতাটি ‘বিদ্রোহী’ কবিতার প্রায় সমপর্যায়ের জনপ্রিয়। ছন্দের স্ফূর্তিই মূলত এই কবিতা পাঠে প্রণোদনা তৈরি করে। এ প্রসঙ্গে নজরুল সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার কবিতাটি সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন মোসলেম ভারতে প্রেরিত একটি চিঠিতে। তিনি লিখেছিলেন,

> ‘খেয়া-পারের তরণী’ শীর্ষক কবিতায় ছন্দ সর্বত্র মূলত এক হইলেও মাত্রাবিন্যাস ও যতির বৈচিত্র্য প্রত্যেক শ্লোকে ভাবানুযায়ী সুর সৃষ্টি করিয়াছে; ছন্দকে রক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে এই যে একটি অবলীলা, স্বাধীন স্ফূর্তি, অবাধ আবেগ, কবি কোথাও তাহাকে হারাইয়া বসেন নাই; ছন্দ যে ভাবের দাসত্ব করিতেছে – কোনখানে আপন অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে নাই – এই প্রকৃত কবি-শক্তিই পাঠককে মুগ্ধ করে। কবিতাটি আবৃত্তি করিলেই বোঝা যায় যে, শব্দ ও অর্থগত ভাবের সুর কোনখানে ছন্দের বাঁধনে ব্যাহত হয় নাই। বিস্ময়, ভয়, ভক্তি, সাহস, অটল বিশ্বাস এবং সর্বোপরি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটা ভীষণ-গম্ভীর অতিপ্রাকৃত কল্পনার সুর, শব্দবিন্যাস ও ছন্দঝঙ্কারে মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। (কাজী নজরুল ১, ২০১৪: ৭৬)

উৎসর্গ কবিতা ‘অগ্নি-ঋষি’ মূলত গান। কারণ, গ্রন্থভুক্ত হওয়ার পূর্বে ১৩২৮ সনের শ্রাবণের *উপাসনা* পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, সেখানে শিরোনামের নিচে ‘তিলক-কামোদ, ঝাঁপতাল’ লেখা ছিল, যদিও আবৃত্তির সময় মাত্রাবৃত্তে তিন/তিন ঝোঁকে স্বাচ্ছন্দ্য লাগে। কিন্তু ঝাঁপতাল অর্থাৎ দুই+তিন, দুই+তিন ছন্দে গঠিত হলে গাইবার সময় ছন্দের ভেতরের গতি বা আন্দোলন পাল্‌টে নিতে হয়। যেমন:

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ / ১ ২ ৩ ১ ২ ৩

অ গ নি ঋ ষি ০ / অ গ নি বি না ০

ঝাঁপতালে ছন্দ বিভাজনের ভিন্নতা দেখা যায়:

১ ২ ১ ২ ৩ / ১ ২ ১ ২ ৩

অগ্ নি ঋ ০ ষি / অগ্ নি বি ০ না

এই ভিন্নতা অবলম্বন করলে পুরো কবিতাকে সুরাবদ্ধ করতে স্বতঃস্ফূর্ততার কোনো অভাব ঘটে না, যদি তা গতি বা চলনকে একই ধরনের বা খুব কাছাকাছি ভিন্ন কোনো চলন দিয়ে অভিযোজন করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ কবিতার ছন্দ কবির বেঁধে দেয়া শর্তের অধীনে চলে অথবা গীতের ছন্দ সুরকারের ভাবানুযায়ী সেই ছন্দকে নতুন কোনো ঝোঁকের বশীভূত করা যায়।

তবে 'প্রলয়োল্লাস' কবিতার ছন্দের ঝোঁকের সাথে নিতাই ঘটকের সুরারোপিত দ্রুত দাদরার ছন্দঝোঁক প্রায় সমার্থক। অর্থাৎ স্বাধীনভাবে আবৃত্তি করলেও প্রায় একই ঝোঁক তৈরি করে। তাতে লয় যেন প্রলয়ের মতো গতিময় চঞ্চল। গীতিকবিতার সাথে অন্য কবিতার স্বাতন্ত্র্য এখানেই। গীতির সুরের চলনে এবং পরিমাপে যেন অস্বস্তি তৈরি না করে, এক্ষেত্রে স্টিভেনের 'ভোকাল মিউজিক' করার শর্ত এখানে মিলে যায়। কিন্তু 'বিদ্রোহী' ও 'ধূমকেতু'র চলন ও পরিমাপ গীতিকারের শর্তের সাথে মেলানো যায় না, মেলালে এই কবিতার বিস্তারণের শক্তি এমনকি তাঁর কাব্যিকতা হারায়। একারণে এই ধরনের কবিতাকে সংগীত বা গান বানানো বিপজ্জনক, অন্তত কবিতার ক্ষেত্রে। কারণ এই কবিতা নিজেই সংগীতকে তাঁর নিজস্ব ভাব ও ছন্দের গভীরে ধারণ করে। যা স্টিভেনের ভাষা 'এভোকেশন অব মিউজিক'-এর প্রতিনিধিত্ব করে, যা র‍্যাপ মিউজিকে দৃশ্যমান। সংগীত এই ধরনের কবিতার গভীরে এমনভাবে বিকিরণ দেয় যে, তা থেকে অনন্য সুন্দর দৃশ্যের আলো-আঁধারির রহস্য তৈরি করে। কিন্তু তা গানে রূপান্তর করলে সেই সৌন্দর্যের স্থাপত্য বালির পাহাড়ের মতো ভেঙে পড়ে। 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রাসঙ্গিকতা হলো 'জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি' জাতীয়। অর্থাৎ 'অমঙ্গল অভিশাপ আর শনির জ্বালানো রুদ্র চুল্লির মধ্যে বসে নব সৃষ্টির সাধনা করা' (কাজল, ২০২২: ৯), ফলে আলাদা ফর্মে কাজ না করে সেই ফর্মের ভেতরেই অন্য শিল্প-মাধ্যমের ফর্মকে উদ্দীপ্ত বা দ্রবীভূত করে দেয়ার কৌশল। আর টেক্সচার বা বুননের কথা যদি বলি, 'বিদ্রোহী' কিংবা অন্যান্য কবিতা এখানে মহা অমানিশার ন্যায় রুক্ষ বিক্ষুব্ধ ইমেজ তৈরি করে, তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে আরো ভয়ানক ক্ষিপ্রতা-রুক্ষতাই কাম্য, বিপরীত বলতে এখানে কোমল কিংবা মসৃণতা নয়। সংগীতের প্রতিসম (symmetrical) চরিত্র অনমনীয়-দুর্বিনীত-বিস্ময়কর নৃশংসতাকে কিছুটা হলেও দমিত করে। সুরের এই শৃঙ্খলা আধুনিক শিল্পদর্শনে মিউজিকের থেকেও সাউন্ডকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। এই কবিতাটি জনপ্রিয় হওয়ার আরেকটি প্রধান কারণ হলো, কবিতার ছন্দ বা প্রসেডির বৃত্ত ছাপিয়ে তা সংগীতের রিদমের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

বাঙালির সংগীত সমাজে এই উপাদানগুলো নিয়ে নন্দনতত্ত্বের মাঠে টুকরো-টাকরা আলোচনা হলেও সংগীত নির্মাণের আবশ্যকতায় তার যুক্ত হওয়াটা অনেকটা ঐচ্ছিক থেকে গেছে, কারণ এতদঞ্চলের সংগীতসমাজ তাঁর মননশীলতায় এখনও মনোফোনিক বা একরৈখিক অনুভূতিকেই ধারণ করে চলেছে। একথাটি অভিযোগের সুর হিসেবে বিবেচিত হবে না বরং বিশেষত্ব অর্থে বিবেচনা করা যাবে, কারণ এই একরৈখিকতা অলঙ্কারের আবরণে এমন এক ঐশ্বর্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে, যা নিয়ে সৌন্দর্যতত্ত্বের ভিন্ন এক জগৎ

নির্মিত হয়েছে। লক্ষণীয় যে, এইদেশে শুধু সুর যেমন উচ্চমার্গীয় শ্রোতা ছাড়া সাধারণকে আকৃষ্ট করতে চায় না, একইভাবে বিমূর্ত শিল্পকলাও সাধারণ দর্শকের হৃদয়কে তোলপাড় করে না। কারণ, তার ভেতরে বহু-বর্ণিল টেক্সচারের ধারণা (imaginative cell) জন্মেনি। যদি কোনো শিল্পী একটি জীর্ণ গাছের একটুকরো বাকলের ছবি আঁকে, সেখানে তো সময়ের অজস্র ইতিহাস কিংবা ক্ষয়ে যাওয়া বিবর্তনের ঘটনাবলি আটকে আছে, কিন্তু শিল্পীর এই গভীর উপলব্ধিকে ধরবার সক্ষমতা খুব কম মানুষের জন্মেছে। শিল্পীর অসীম একাকিত্ব এখানে, 'আমি চির-বিদ্রোহী বীর–, বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি 'একা' চির উন্নত শির।' এই একাকিত্ব আমির অবয়বে প্রতিষ্ঠিত।

রোমান্টিসিজম ও মডার্নিজম

যাইহোক, নজরুলের 'বিদ্রোহী' ও 'ধূমকেতু' কবিতায় 'আমিত্বের ব্যবহার' অন্তত রোমান্টিক যুগের প্রভাবজাত। এ সময়ের শিল্পের প্রধান প্রবণতা হলো, আমিত্বের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ যা প্রত্যেক আমি, কিংবা সমগ্রের আমির উন্মুক্ত প্রকাশ। ব্যক্তি আমি যে ধনী-দরিদ্র, ক্ষমতাবাজ-অক্ষম নির্বিশেষে প্রত্যেকের স্বাধীন উন্মোচন, এই ভাবধারায় ওয়াল্ট হুইটম্যান লিখেছিলেন 'One's self I sing', অথবা 'Song of myself ইত্যাদি কবিতা। উদাহরণস্বরূপ:

> One's-Self I sing, a simple separate person,
> Yet utter the word Democratic, the word En-Masse.
> Of physiology from top to toe I sing.
> Not physiognomy alone nor brain alone is worthy for the Muse,
> I say the Form complete is worthier far,
> The Female equally with the Male I sing. (philadelphia.edu: Online)

Song of myself কবিতায়:

> I celebrate myself, and sing myself,
> And what I assume you shall assume,
> For every atom belonging to me as good belongs to you.
> I loafe and invite my soul,
> I lean and loafe at my ease observing a spear of summer grass.
> My tongue, every atom of my blood, form Öd from this soil, this air,
> Born here of parents born here from parents the same,
> and their parents the same,
> I, now thirty-seven years old in perfect health begin,
> Hoping to cease not till death... (poetryfoundation: online)

'প্রলয়োল্লাস' কবিতাটিকে নিতাই ঘটক সরাসরি গানে ও সুরে রূপান্তর করেছেন। এখানে বাংলার প্রচলিত সুর ব্যবহার না করে বীর রসাত্মক সুর প্রয়োগ করা হয়েছে যা ওয়াল্‌জের ঝোঁকের মতো। তবে এই ধরনের সুর সাধারণত মার্চ মিউজিকে দুর্লভ। মার্চ মিউজিক দুই

বা চার মাত্রার হয়। নজরুলের অধিকাংশ সৈনিক সংগীত তিনমাত্রার ছন্দে। এমনকি 'চল্ চল্ চল্'-এর মতো স্পষ্ট মার্চ সংগীত ও তিনমাত্রার ছন্দে প্রতিষ্ঠিত। সার্বিক দিক বিচার করলে *অগ্নি-বীণার* প্রত্যেকটি কবিতা ভিন্ন ভিন্ন মেজাজ অবলম্বন করে তার সাংগীতিকতা প্রদর্শন করে।

মিথের প্রতীকায়ন

অগ্নি-বীণায় সাংগীতিকতা অনুভবের ক্ষেত্রে নজরুল মিথ ও ঐতিহ্যের আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন 'মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ' 'বিদ্রোহী' কবিতার চুম্বক পদ। এই নটরাজই মহাদেব শিব, যিনি নৃত্য ও সংগীত সৃষ্টি করেছেন। (দেব্রত, ২০২২: ৪২) যিনি ভারতীয় পুরাণে প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসের প্রতীক। কবি অন্যত্র বলছেন, 'আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি স্বর্গ-পাতাল-মর্ত্য' অথবা 'আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ, আমি আপনার তালে নেচে যাই আমি মুক্ত জীবনানন্দ', এই কথাসমূহ সমার্থক। এই শিব তাণ্ডব নৃত্য করে প্রলয় ঘটান, এরপর তাঁর মন শান্ত হলে পার্বতীরূপে নারীসুলভ আবেগময় লাস্য নৃত্যের মাধ্যমে জাগ্রত করেন নতুন লয় বা নবসৃষ্টি কিংবা 'মুক্ত জীবনানন্দ' হয়ে ওঠেন। নৃত্যশেষে মহাদেব ডমরুতে ছন্দ ও সুর তোলেন। এই ডমরু বাজিয়েই মোহ, অজ্ঞতা ও অন্ধকারের প্রতীক মায়াসুরকে দলিত মথিত করেন। ডমরুর ধ্বনি থেকে শিবসূত্র, ব্যাকরণ ও নাট্যশাস্ত্র সৃষ্টি হয়েছে। সেই নাট্যশাস্ত্রেই সংগীতের মূলসূত্র লুকোনো। অর্থাৎ কিনা নজরুল নটরাজ রূপে নিজেকে যেভাবে উন্মোচন করেছেন, সেই ধরনের অদম্য ব্যক্তিত্ব প্রত্যাশা করেন যিনি শুধু শুধুই বীর নন, উচ্চতর শিল্পকলার ধারক, সংগীতের স্রষ্টা।

আরেক স্থানে তিনি তিনটি রাগ পাশাপাশি ব্যবহার করেছেন 'আমি হাম্বীর, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল'। পাশাপাশি তিনটি রাগের ব্যবহার করে তিনটি ভাবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, একই সাথে তিনটি বীরত্বপূর্ণ চরিত্রেরও উন্মোচন ঘটিয়েছেন। যা বিদ্রোহের সার্থকতায় পরিপূরক। 'এই রাগিণীগুলো কল্যাণ ঠাটের অন্তর্গত' তবে হাম্বীর রাগ হিসেবে পরিচিত। অন্যদিকে মল্ল রাজবংশের ৪৯তম শাসক বীর হাম্বীর (১৫৬৫-১৬২০) ১৫৮৬ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন, রাঢ়বঙ্গে পাঠান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ছায়ানট শব্দের মধ্যেই লুকিয়ে আছে নটের ছায়ার রূপ, রাগ হিসেবেও সান্ধ্যকালীন মতান্তরে রাগের দ্বিতীয় প্রহর, সুর হিসেবেও উচ্চ-বিষাদী ভাব, ধ্বংস কিংবা বিয়োগ ব্যাথার পর তাকে শিল্প সুষমা দিয়ে বরণ করে নেবার মতো এক ব্যক্তিত্বের স্বরূপ। রাগ হিন্দোল গম্ভীর কিন্তু ঋতু-প্রকৃতি সৌন্দর্য প্রকাশক। অর্থাৎ পূর্ণতা কিংবা সৃষ্টির স্বরূপকেই দেখাতে চেয়েছেন। একটি সাংগীতিক প্রক্রিয়ায় এই তিনটি রূপ থাকলে তা পূর্ণতা পায়, একই ঠাটের তিনটি রাগ, তিনটি রূপ, খুবই চৌকস ব্যাবহার।

'আমি প্রণব-নাদ প্রচণ্ড!' এই নাদ হল আদিধ্বনি যা সংগীতের মূল শব্দ, নাদই হল সাংগীতিক স্বর, যা ওম্ বা ওঙ্কারও বটে। সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা এই শব্দ সৃষ্টি করেন।

'বিদ্রোহী' কবিতায় তিনি আরেক স্থানে 'আমি সুর-সৈনিক' বা 'আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার'। এ ওঙ্কার বেজে ওঠে মহাশঙ্খে, অথবা এই ওঙ্কারধ্বনি ইসরাফিলের শিঙা বললেও অত্যুক্তি হবে না। অর্থাৎ কবি অসংখ্য অনুষঙ্গের পাশাপাশি অসংখ্য সাংগীতিক উপকরণ দিয়ে এই কবিতাসমূহ সাজিয়েছেন।

মৌখিক ও লিখিত ভাষার শিল্পবিতর্ক

মার্শাল ম্যাক্লুহানের একটি বিতর্কিত তত্ত্ব রয়েছে। তিনি বলেছিলেন 'প্রিমিটিভ মানুষ যেহেতু সম্পূর্ণ মৌখিক আদান-প্রদানের উপর নির্ভরশীল তাই তার জীবন অনেক সমৃদ্ধ, অন্যদিকে লিপির আবিষ্কার মানুষকে তার সৃষ্টিশক্তির অত্যধিক ব্যবহার করিয়ে অন্যান্য সংবেদন ক্ষমতার ক্ষতি করেছে।' (প্রদীপ, ২০১৪: ১৭১) কথাটির গুরুত্ব খুঁজে পাওয়া যায় যখন কোনো নৃ-গোষ্ঠীর পরিবেশনা লক্ষ করা যায়, যা তাঁরা এখনও বহন করছে, তা লিখিত ভাষার সামাজিকগণ হারিয়ে ফেলেছে, নিসর্গের সুর ও ধ্বনি থেকে ছিটকে পড়ে মহা শব্দদূষণের ভেতর সাঁতরে চলেছে। প্রতিটি বস্তুর নিজস্ব ধ্বনি আছে এবং তার মর্মার্থও রয়েছে। কিন্তু মেশিনের পৃথিবীতে উচ্চ কোলাহলে এখন সেই মৃদু ধ্বনি শোনা যায় না। এরকম বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে গবেষকদল নৃ-বিদ্যাকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন। পূর্বে উল্লিখিত 'মহান শিল্পীগণের শিল্পের নিজস্ব ভুবন' ও পূর্ণতার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ এই *অগ্নি-বীণা* কাব্যগ্রন্থটি। শতবর্ষ অতিক্রম করে গেলেও এ-কারণে গ্রন্থটির আবেদন এখনও কমেনি। নজরুল কবি হলেও সংগীত প্রতিভার আলোকেই তিনি পূর্ণতা পেয়েছেন এবং *অগ্নি-বীণা* মূলত সাংগীতিকতায় আচ্ছাদিত বলেই পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেছে। নজরুলের শিল্পদর্শন সমন্বয়মূলক ছিল বলে তিনি বিচিত্র শাখায় কাজ করেছেন। তা মূল্যায়ন করতে হলে আগামীর পাঠকদের আন্তঃসম্পর্কীয় দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হতে হবে। সে পথেই যাক আগামীর প্রত্যাশাসিক্ত সমাজ।

গ্রন্থপঞ্জি

কাজল কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০২২। ভূমিকা, দেব্রত নীল সম্পাদিত *কাজী নজরুলের বিদ্রোহী কবিতার পৌরাণিক আবেদন*, সময় প্রকাশন, ঢাকা ।

কাজী নজরুল ইসলাম, ১৯৯৬। *নজরুল-রচনাবলী ১ম খণ্ড*, আবদুল কাদির (সম্পাদক), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

কাজী নজরুল ইসলাম, ২০১৪। *অগ্নি-বীণা*, ৭ম মুদ্রণ, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

দেব্রত নীল. ২০২২। *কাজী নজরুলের বিদ্রোহী কবিতার পৌরাণিক আবেদন*, সময় প্রকাশন, ঢাকা।

প্রদীপ বসু, ২০১৪। *ভাষা দর্শন সংগীত সমীক্ষা ও সন্ধান*, অনুষ্টুপ, কলকাতা ।

প্রবাসী https://bn.wikisource.org/wiki/পাতা: প্রবাসী-%প্রথম-ভাগ%29.djvu/২৯৭

সুধীন দাশ, *নজরুল-সঙ্গীত স্বরলিপি*, পঞ্চম খণ্ড। ১৪ সংখ্যক গান, কবি নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা

Bernhart, Walter, 2004. *Essays on Literature and Music (*1967-2004) by Stiven Paul Scher. Rodopi B. V, New York.

Kamien, Roger, 1992. *Music an Appreciation,* McGRAW-HIL, INC. New York.

European anthem, https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/symbols/european-anthem_en

One's self I sing. (Walt Whitman's poem) https://www.philadelphia.edu.jo/academics/mjayyousi/uploads/American7.pdf

I celebrate myself, and sing myself, (Walt Whitman's poem) https://www.poetryfoundation.org/poems/45477/song-of-myself-1892-version